প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে হিন্দু-মুসলমান

প্রমথ চৌধুরী

বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ

বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ

বিদ্যার বহু বিস্তীর্ণ ধারার সহিত শিক্ষিত-মনের যোগসাধন করিয়া দিবার জন্য ইংরেজিতে বহু গ্রন্থমালা রচিত হইয়াছে ও হইতেছে। কিন্তু বাংলা ভাষায় এরকম বই বেশি নাই যাহার সাহায্যে অনায়াসে কেহ জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগের সহিত পরিচিত হইতে পারেন। শিক্ষাপদ্ধতির ত্রুটি, মানসিক সচেতনতার অভাব, বা অন্য যে-কোনো কারণেই হউক, আমরা অনেকেই স্বকীয় সংকীর্ণ শিক্ষার বাহিরের অধিকাংশ বিষয়ের সহিত সম্পূর্ণ অপরিচিত। বিশেষ, যাঁহারা কেবল বাংলা ভাষাই জানেন তাঁহাদের চিত্তানুশীলনের পথে বাধার অন্ত নাই; ইংরেজি ভাষায় অনধিকারী বলিয়া যুগশিক্ষার সহিত পরিচয়ের পথ তাঁহাদের নিকট রুদ্ধ। আর যাঁহারা ইংরেজি জানেন, স্বভাবতই তাঁহারা ইংরেজি ভাষার দ্বারস্থ হন বলিয়া বাংলা সাহিত্যও সর্বাঙ্গীণ পূর্ণতা লাভ করিতে পারিতেছে না।

যুগশিক্ষার সহিত সাধারণ-মনের যোগসাধন বর্তমান যুগের একটি প্রধান কর্তব্য। বাংলা সাহিত্যকেও এই কর্তব্য পালনে পরাঙ্মুখ হইলে চলিবে না। তাই এই দুর্যোগের মধ্যেও বিশ্বভারতী এই দায়িত্ব গ্রহণে ব্রতী হইয়াছেন।

১৩৫০ সাল হইতে এযাবৎ বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহের মোট ১০০ খানি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। প্রতি গ্রন্থের মূল্য আট আনা। পত্র লিখিলে পূর্ণ তালিকা প্রেরিত হইবে।

বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহের পরিপূরক লোকশিক্ষা গ্রন্থমালার পূর্ণ তালিকা মলাটের তৃতীয় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। পত্র লিখিলে বিস্তারিত বিবরণ প্রেরিত হইবে।

প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে হিন্দু-মুসলমান

প্রমথ চৌধুরী

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
২, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট
কলিকাতা

বহু লোকের ধারণা যে, হিন্দু-মুসলমানের বিরোধটা এ দেশে এতকাল ধরে চলে আসছে যে, আজকের দিনে সে বিরোধকে মিলনে পরিণত করবার কোনো সহজ উপায় নেই। যে বিরোধের মূল অতীতে নিহিত, আর যে বিরোধ যুগ-যুগান্তর ধরে ক্রমশ বৃদ্ধি ও প্রশ্রয় প্রাপ্ত হয়েছে, সে বিরোধ শুধু মুখের কথায় কিংবা কাগজের লেখায় দূর করা যাবে না।

যে বিরোধ আজকের দিনে পলিটিক্সের ক্ষেত্রে ফুটে উঠেছে মূলত তা ঐতিহাসিক কি না, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। ভারতবর্ষের যে যুগকে আমরা মুসলমান-যুগ বলি, সে যুগের ইতিবৃত্ত আমরা অনেকেই জানি নে। এমনকি, ভারতবর্ষের এই নিকট-অতীতের অপেক্ষা তার দূর-অতীত আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কাছে অধিক পরিচিত। যদিচ মুসলমান-যুগের ধারাবাহিক ইতিহাস আছে, হিন্দু-যুগের নেই।

এর একটি কারণ এই যে, মুসলমান-যুগের কোনো হিন্দু-ইতিহাস নেই। ঐতিহাসিক ভিন্‌সেণ্ট স্মিথ বলেন যে, এই সাত শ বৎসরের ভিতর এমন একখানিও হিন্দু-দলিল লিখিত হয় নি যার সাহায্যে এ যুগের ইতিহাস গ'ড়ে তোলা যায়; এ যুগের দলিল ফারসিতে এবং মুসলমানের রচিত।

এ কালের ইংরেজি-শিক্ষিত হিন্দুরা ফারসি ভাষা জানেন না, এমনকি সে ভাষার অক্ষরের সঙ্গে পর্যন্ত তাঁদের পরিচয় নেই। এ যুগ সম্বন্ধে আমাদের মনে যা-কিছু অস্পষ্ট ধারণা আছে, সে ধারণা আমরা লাভ করেছি স্কুলপাঠ্য টেক্স্‌ট বুক-এর প্রসাদে। বলা বাহুল্য, টেক্স্‌ট বুক কেউ পড়ে না, সকলেই তা মুখস্থ করে; আর পরীক্ষা-পাশের সঙ্গেসঙ্গেই সে বিদ্যা আমরা মাথা থেকে যত শিগ্‌গির পারি বহিষ্কৃত করে দিই। অতঃপর 'ভাণ্ডানুসারী স্নেহবৎ' অর্থাৎ তেলের ভাঁড় থেকে তেল ফেলে দিলে তার

অভ্যন্তরে যেমন কিঞ্চিৎ তেল লেগে থাকে সেইরূপ ঐতিহাসিক জ্ঞান আমাদের মস্তিষ্কে জড়িয়ে থাকে।

ফলে আমরা যখন ভারতবর্ষের মুসলমান-যুগ সম্বন্ধে লেখায় ও বক্তৃতায় স্নেহ প্রকাশ করি, তখন তা 'ভাণ্ডানুসারী স্নেহবৎ'ই গাঢ় হয়। এই তো গেল আমাদের হিন্দুদের কথা। আমাদের শিক্ষিত মুসলমান ভ্রাতাদেরও যে উক্ত যুগ সম্বন্ধে কোনোরূপ বিশেষ জ্ঞান আছে তা বোধ হয় না।

তাঁদের কথা শুনে মনে হয় যে, তাঁদের বিশ্বাস, ভারতবর্ষের মুসলমান-মাত্রই মোগল-পাঠানের বংশধর; যেমন অনেক হিন্দুর বিশ্বাস যে, হিন্দুমাত্রেই মুনিঋষিদের বংশধর। এ উভয় বিশ্বাসই সমান সমূলক; অর্থাৎ অধিকাংশ হিন্দুও যাদৃক্ আর্যবংশী, অধিকাংশ মুসলমানও তাদৃক্ রাজবংশী। এসব অদ্ভুত ধারণা মানুষের মন থেকে দূর করবার চেষ্টা অবশ্য পণ্ডশ্রম, বিশেষত এ যুগে। কেননা, এ যুগে বিশ্বমানবের যুগধর্ম হচ্ছে কুলজি নিয়ে বাগ্‌বিতণ্ডা করা। ইংরেজরা দাবি করেন যে তাঁরা জর্মনবংশীয়, আর ফরাসিরা বলেন যে তাঁরা ল্যাটিনবংশীয়। এসব দাবির একমাত্র সুফল হচ্ছে পরস্পরের ভিতর আবার নূতন করে মানসিক বিরোধের সৃষ্টি। মানুষের পক্ষে তার origin খোঁজটা বড় সুবুদ্ধির কাজ নয়। কেননা, তাতে কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে পড়বার সম্ভাবনা। পূর্বপুরুষের সন্ধানে অতীতের মাটি বেশি খুঁড়লে মানুষ নাকি আবিষ্কার করতে বাধ্য যে, আদিম নর হচ্ছে বানর। অন্তত, এই তো বৈজ্ঞানিকদের মত।

সে যাই হোক, এ কথার ভুল নেই যে মুসলমান-যুগের ইতিহাস সম্বন্ধে সাধারণত এ যুগের শিক্ষিত হিন্দু অজ্ঞ এবং শিক্ষিত মুসলমান বিশেষজ্ঞ নন।

তার পর ঐতিহাসিকদিগের মুখে আর-একটি কথা শুনতে পাই যে, মুসলমান-যুগে বাংলার কোনো ইতিহাস নেই। বক্তিয়ার খিলিজির

আগমন থেকে পলাশীর যুদ্ধের সময় পর্যন্ত বাংলা ভারতবর্ষের ইতিহাসের ভিতর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল। অর্থাৎ যুদ্ধ-মারামারি-কাটাকাটিকেই যাঁরা ইতিহাসের একমাত্র সম্বল মনে করেন তাঁদের মতে বাংলার নবাবি আমল হচ্ছে ইতিহাসবর্জিত যুগ। ফারসি-নবিশ হলেও এ যুগের বিশেষ-কোনো বিবরণ জানবার জো নেই। বাংলার ফারসি ইতিহাস খুব কমই আছে; আর যে দু-চারখানি আছে সে দু-চারখানিও নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। অতএব ঐতিহাসিকদিগের মতে এ সাত শ বৎসর বাঙালি জাত যে বেঁচে ছিল তার কোনো প্রমাণ নেই। পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় আমাদের বহুকাল থেকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন যে, বাঙালি আত্মবিস্মৃত জাত। বাঙালির এতে কোনো দোষ নেই, কেননা হিন্দুমাত্রেই আত্মবিস্মৃত জাত। বাংলার বিশেষত্ব এই যে, প্রায় হাজার বৎসর ধরে বাংলা ভারতবিস্মৃত দেশ হয়ে পড়েছিল। বক্তিয়ার খিলিজির স্পর্শে এ দেশ মূর্ছিত হয়ে পড়েছিল, আর ইংরেজের স্পর্শে তার আবার জ্ঞান হয়েছে— এই হচ্ছে ঐতিহাসিকদিগের ধারণা।

বাঙালি মুসলমান-যুগে বাংলার ইতিহাস না গড়ুক বাংলা সাহিত্য গড়েছে, এবং সেই সাহিত্য থেকে বাঙালি-জীবনের ইতিহাস না পাওয়া যাক, তার মনের ইতিহাস কতকটা পাওয়া যায়। যাকে আমরা মানবসমাজের বাহ্যঘটনা বলি তার মূলে আছে মানুষের মনোভাব, আর বাহ্যঘটনাও মানুষের মনের উপর তার ছাপ রেখে যায়। সুতরাং মুসলমান-যুগের বাংলা সাহিত্যে যে মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায় তা থেকে সে যুগে হিন্দু-মুসলমানের ভিতর সম্বন্ধ কিরূপ ছিল তাও কতকটা অনুমান করা যায়।

এই দুই জাতি এই সাত শ বৎসর ধরে পরস্পর যদি শুধু মারামারি-কাটাকাটি করত তা হলে উক্ত যুগের বাংলা সাহিত্যে তার কতকটা আভাস নিশ্চয়ই পাওয়া যেত। যদিচ বাংলা সাহিত্য হিন্দুর রচিত

সাহিত্য তবুও সে সাহিত্যে মুসলমানের প্রতি হিন্দুর তাদৃশ বিদ্বেষভাবের পরিচয় পাওয়া যায় না। এর থেকে অনুমান করা অসংগত হবে না যে, যে কালে বাংলা সাহিত্য জন্মলাভ করে অন্তত সে সময় এ দেশে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই মোটের উপর মিলে-মিশে বাস করতে শিখেছিল, এবং তাহাদের পরস্পরের ভিতর যেসব বিরোধের কারণ ছিল তার একটা আপসমীমাংসা তারা করে নিয়েছিল।

জেতা ও জিতের মধ্যে দাম্পত্য প্রণয় জন্মানোটা স্বাভাবিক নয়। বিশেষত যে ক্ষেত্রে জেতা হচ্ছেন যুগপৎ বিদেশী ও বিধর্মী। সুতরাং সেকালে হিন্দু-মুসলমানের ভিতর সম্পূর্ণ মনের মিলন যে ঘটে নি, সে কথা বলাই বাহুল্য। তবে মুসলমান কর্তৃক বঙ্গবিজয়ের ফলে এ দেশে যে একটা বড়গোছের সামাজিক বিপ্লব ঘটেছিল, তার প্রমাণ বাংলা সাহিত্যে পাওয়া যায় না। আমার ধারণা, মুসলমান বাদশারা বাঙালির সামাজিক জীবনের উপর বিশেষ-কোনো হস্তক্ষেপ করেন নি। অন্তত তাঁরা যে বাঙালির মনের উপর বিশেষ কোনোরকম জবরদস্তি করেন নি তার প্রমাণ বাংলা সাহিত্য ; ও সাহিত্য কতক অংশে প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যেরই জের টেনে নিয়ে এসেছে, আর কতক অংশে হিন্দুসমাজে যেসকল নূতন ধর্মমত জন্মলাভ করেছিল তারই আশ্রয়ে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে। রামায়ণ, মহাভারত, বৈষ্ণবধর্ম, শাক্তধর্ম, চণ্ডীর উপাখ্যান, মনসার উপাখ্যান এই সবই হচ্ছে বঙ্গসাহিত্যের উপাদান ও অবলম্বন। এর থেকে দেখা যায় যে, মুসলমান-যুগে অন্তত বঙ্গদেশে হিন্দুসম্প্রদায় তার স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণ বজায় রেখেছে। মুসলমানের ভাষাও বাংলা ভাষাকে রূপান্তরিত করতে পারে নি। আধা প্রাকৃত ও আধা ফারসি উর্দু নামক বর্ণসংকর ভ ষাও বাংলাদেশে জন্মলাভ করে নি। তাই মনে হয় যে, বাঙালির জীবনে ও মনে মুসলমানধর্ম ও মুসলমান-রাজশক্তি বিশেষ কোনো শক্তি প্রয়োগ করে নি।

সাধারণত বাঙালির ধারণা যে, চণ্ডীদাসই বঙ্গসাহিত্যের আদিকবি, এবং এ বিশ্বাস ত্যাগ করবার বিশেষ-কোনো কারণ নেই। সম্প্রতি পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় নেপাল থেকে কতকগুলি বৌদ্ধ দোঁহা সংগ্রহ ক'রে এনেছেন এবং শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু শূন্যপুরাণ নামে একখানি পুস্তক প্রকাশ করেছেন। শুনতে পাই, এই দোঁহাবলী এবং এই পুরাণই বাংলাভাষার আদি পদাবলী ও আদি কাব্য। শূন্যপুরাণ কবে লিখিত হয়েছিল তা কেউ বলতে পারেন না। উক্ত পুরাণের এক অংশে মুসলমান কর্তৃক জাজপুরের মন্দিরভঙ্গের একটি নাতিহ্রস্ব বর্ণনা আছে। বলা বাহুল্য, এ বর্ণনা হিন্দু-যুগে লিখিত হয় নি, এবং শূন্যপুরাণের উক্ত অধ্যায়টি প্রক্ষিপ্ত ব'লে উড়িয়ে দেবারও জো নেই। কেননা, যে ভাষার উপর ভিত্তি ক'রে উক্ত পুস্তকের প্রাচীনতা নির্ণয় করা হয়, উক্ত বর্ণনাও সেই একই ভাষায় লিখিত। সুতরাং গৌড়ের কোন্ মুসলমান বাদশা জাজপুরের হিন্দুমন্দির ধ্বংস করেন, যতদিন সে খবর না পাওয়া যায় তত দিন উক্ত কাব্য যে চণ্ডীদাসের পূর্বে রচিত, এমন কথা নিঃসংশয়ে বলা যায় না।

একটি বিষয়ে কিন্তু সন্দেহ নেই। এ কাব্য হিন্দুসমাজের নিম্নশ্রেণীর লোকের লেখা এবং সেই শ্রেণী ছিল বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ও ঘোর ব্রাহ্মণ-বিদ্বেষী। যদি শূন্যপুরাণের বর্ণিত ঘটনা সত্য বলে স্বীকার করা যায় তা হলে স্বীকার করতে হবে যে, সেকালে বাংলার নীচজাতিরা মুসলমান কর্তৃক ব্রাহ্মণ্যধর্মের বিনাশ অতিশয় আহ্লাদের বিষয় মনে করত; এক-কথায় তারা মুসলমানদের ব্রাহ্মণ-অত্যাচারের হাত থেকে দেশের লোকের উদ্ধারকর্তা মনে করত। উক্ত বর্ণনাটি একটু লম্বা হলেও এখানে উদ্ধৃত করে দিচ্ছি। কেননা, আমার বিশ্বাস, বাংলার শিক্ষিত সমাজের সঙ্গে শূন্যপুরাণের পরিচয় নেই। প্রথমত ব্রাহ্মণের অত্যাচারের এইরূপ বর্ণনা আছে—

দখিন্ন্যা মাগিতে জায়, জার ঘরে নাঞ্চি পায়—
সাঁপ দিআ পুড়াএ ভুবন।...
বলিষ্ট হইল বড় দস বিস হয়্যা জড়
সদ্ধম্মিরে করএ বিনাস।
বেদ করে উচ্চারন বের্যাঅ অগ্নি ঘনে ঘন
দেখিআ সভাই কম্পমান।
মনেত পাইয়া মম্ম সভে বোলে রাখ ধম্ম
তোমা বিনা কে করে পরিত্তান।
এইরূপে দ্বিজগন করে স্থষ্টি সংহারন
ই বড় হোইল অবিচার।...
ধম্ম হৈলা জবনরূপি মাথাএ ত কাল টুপি
হাতে সোভে ত্রিকচ কামান।
চাপিআ উত্তম হয় ত্রিভুবনে লাগে ভয়
খোদায় বলিয়া এক নাম॥...
জতেক দেবতাগন সভে হয়্যা একমন
আনন্দে ত পরিল ইজার॥...
দেউল দেহারা ভাঙ্গে কাড়্যা ফিড়্যা খায় রঙ্গে
পাথড় পাথড় বোলে বোল।
ধরিআ ধম্মের পায় রামাঞি পণ্ডিত গায়
ই বড় বিসম গণ্ডগোল॥

এ স্থলে বলা আবশ্যক, রামাঞি পণ্ডিতের মতে 'জতেক দেবতাগন সভে হয়্যা একমন' ইজার পরেছিলেন। উক্ত বর্ণনা থেকে এই জ্ঞান লাভ করা যায় যে, বাংলার বৌদ্ধদের উপর ব্রাহ্মণের বিশেষ অত্যাচার ছিল এবং তারা মুসলমানদের উক্ত অত্যাচারের হাত থেকে পরিত্রাণকর্তা দেবতার অবতার মনে করত। তবে এ ঘটনা ঐতিহাসিক কি পৌরাণিক বলা অসম্ভব। এই তারিখবিহীন গ্রন্থ বাদ দিয়ে আমাদের পরিচিত সাহিত্যে আসা যাক।

চণ্ডীদাসের পদাবলী পড়ে তিনি যে মুসলমান-যুগে বাস করতেন তার কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। তাঁর কাব্যে আরবি ফারসি শব্দ একরকম নেই বললেই হয়, যদি দু-দশটি থাকে তো সেগুলি খুঁজে বার করতে হয়। সুতরাং চণ্ডীদাসের যুগে হিন্দু-মুসলমানের ভিতর কোনো বিষম গণ্ডগোল ঘটেছিল ব'লে তো মনে হয় না। অন্তত তাঁর মৌনতা থেকে অনুমান করা যায় যে, সেকালে হিন্দুদের মুসলমান বাদশায় কোনো অসম্মতি ছিল না, কেননা তাঁরা হিন্দুর ধর্মের উপর কোনোরূপ হস্তক্ষেপ করতেন না।

চৈতন্যের প্রবর্তিত নববৈষ্ণবধর্মের সৃষ্টির সঙ্গে হিন্দু-মুসলমানের ভিতর ধর্ম নিয়ে যে বিবাদ ঘটবে, এ অনুমান সহজেই করা যায়। কেননা, এই নববৈষ্ণবধর্মে মুসলমানও দীক্ষিত হতে পারত, এবং এ সূত্রে যে মুসলমান রাজ-পুরুষদের সঙ্গে বৈষ্ণবসমাজের কতকটা বিরোধ ঘটেছিল তার প্রমাণ বৈষ্ণব সাহিত্যেই পাওয়া যায়। কিন্তু এ বিরোধ যে একটা বিষম গণ্ডগোলে দাঁড়ায় নি তার পরিচয়ও উক্ত সাহিত্যেই পাওয়া যায়।

চৈতন্যমঙ্গল চৈতন্যভাগবত ইত্যাদি গ্রন্থে যেসকল ঘটনার উল্লেখ আছে সেসকল যে সম্পূর্ণ কাল্পনিক নয় এবং প্রকৃতপক্ষে সেসকল ঘটনা যে ঘটেছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ করবার কোনো কারণ নেই। ইউরোপে যেসকল দলিলমূলে সে দেশের ইতিহাস রচিত হয়েছে, চৈতন্যযুগের বৈষ্ণব-দলিলগুলিও সেই জাতীয়। সুতরাং পূর্বোক্ত গ্রন্থগুলি থেকে সেকালের বাংলার অবস্থা অনেকটা জানা যায়।

জয়ানন্দ ও লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গলে নবদ্বীপে রাজভয়ের বর্ণনা আছে। সে সময় গৌড়ের বাদশা ছিলেন হুসেন শা, এবং বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের উপর হুসেন শার আক্রোশ ও অনুগ্রহের কথা শুধু চৈতন্যমঙ্গল নয়, চৈতন্যভাগবতেও পাওয়া যায়।

কবি জয়ানন্দ বলেন যে, নবদ্বীপের কাছে পিরল্যা নামে এক বিষম

গ্রাম ছিল, যেখানকার অধিবাসী ছিল সব মুসলমান। আর যেহেতু ব্রাহ্মণে যবনে বাদ যুগে যুগে আছে সে কারণ পিরল্যাবাসীগণ গৌড়েশ্বর-বিদ্যমানে এই মিথ্যাবাদ দিল যে—

গৌড়ে ব্রাহ্মণ রাজা হব হেন আছে।
নিশ্চিন্তে না থাকহ প্রমাদ হব পাছে ॥…
এই মিথ্যা কথা রাজার মনেতে লাগিল।
নদীয়া উচ্ছন্ন কর রাজা আজ্ঞা দিল ॥

সুতরাং হুসেন শা কর্তৃক নবদ্বীপে ব্রাহ্মণদের উপর অত্যাচারের কারণ political, religious নয়। এ অবস্থায় হিন্দু-মুসলমান-নির্বিচারে সকল যুগের সকল রাজাই যে-সম্প্রদায় থেকে বিপদের আশঙ্কা আছে সে-সম্প্রদায়কে উচ্ছন্ন দিতে কুণ্ঠিত হন না—

তোমাকে বধিবে যে
গোকুলে বাড়িছে সে—

এ কথা শুনে রাজা কংসও কিছু কম জুলুম করেন নি।

ব্রাহ্মণদের উপর মুসলমানের অত্যাচারের যে বর্ণনা জয়ানন্দ দিয়েছেন তা থেকে দেখা যায় যে, অশ্বত্থগাছের উপর ও হিন্দুর বাজনা বাজাবার উপর সেকালের মুসলমানদেরও রাগ ছিল। উক্ত বর্ণনা থেকে দেখতে পাই যে—

নবদ্বীপে শঙ্খধ্বনি শুনে জার ঘরে।
ধনপ্রাণ লয় তার জাতি নাশ করে ॥

তার পর—

গঙ্গা স্নান বিরোধিল হাট ঘাট যত।
অশ্বত্থ পনস বৃক্ষ কাটে শত শত ॥

অশ্বত্থগাছের ডালকাটা নিয়ে আজও ভারতবর্ষের অপর প্রদেশে হিন্দু-মুসলমানের মারামারি হয়, কিন্তু কাঁঠালগাছের উপরেও যে মুসলমানদের চোট ছিল সে-কথা পূর্বে জানতুম না। বেচারা কাঁঠালের

যে কি অপরাধ তা বোঝা গেল না ; কেননা, কাঁঠালের পাতা তো হিন্দুর পুজোয় লাগে না, তার ফুল কি ফলও তো কোনো দেবতাকে নিবেদন করা হয় না। সে যাই হোক, নবদ্বীপবাসীদের উপর এ অত্যাচার বেশি দিন চলে নি। হুসেন শা অচিরে এ অত্যাচার থামিয়ে নবদ্বীপের হিন্দুদের স্বধর্ম-পালন করতে অবাধ অধিকার দেন। জয়ানন্দ বলেন যে—

গৌড়েন্দ্রের আজ্ঞা নবদ্বীপ সুখে বসু।
রাজকর নাহি সর্ব্বলোক চাষ চষু॥
আজি হৈতে হাট ঘাট বিরোধ যে করে।
রাজকরদণ্ডী হয়ে ত্রিশূল সে পরে॥
দেউল দেহরা ভাঙ্গে অশ্বথ যে কাটে।
ত্রিশূলে চড়াহ তাকে নবদ্বীপের হাটে॥
বৈদ্য ব্রাহ্মণ জত নবদ্বীপে বসে।
নানা মহোৎসব কর মনের হরিষে॥
নাট গীত বাদ্য বাজু প্রতি ঘরে ঘরে।
কলসে পতকা উড়ু মন্দির উপরে॥
পুষ্পের বাজার পড়ু গন্ধের উভার।
শঙ্খ ঘণ্টা বাজুক যন্ত্র জয় জয় কার॥
পূর্ব্বে জেমত ছিল নবদ্বীপ রজধানী।
তার শতগুণ অধিক জেন শুনি॥
নবদ্বীপ সীমাএ জবন জদি দেখ।
আপন ইৎসাএ মার প্রাণে পাছে রাখ॥
দেবপূজা কর সুখে যজ্ঞ হোম দান।
হাট ঘাট মানা নাঞি কর গঙ্গাস্নান॥

উক্ত আদেশ অবশ্য religious intolerance ওরফে fanaticism -এর পরিচায়ক নহে। আর বৈষ্ণবের দল যে নবদ্বীপে 'মনের হরিষে' 'নানা মহোৎসব' করেছিলেন ও 'নাট গীত বাদ্য' যে শুধু ঘরে ঘরে নয়, পথে ঘাটেও অহর্নিশি হত, তার প্রমাণ ঐ নৃত্যগীতবাদ্যের চোটে যবনের

নয়, নবদ্বীপের টোলের ব্রাহ্মণের কান ঝালাপালা ও প্রাণ অস্থির হয়ে উঠেছিল।

হুসেন শার আমলে আর-এক ঘটনা ঘটে, যাতে মুসলমানের ধর্ম-বিশ্বাসে বিশেষ আঘাত লাগবার কথা। যবন হরিদাস মুসলমানধর্ম ত্যাগ করে বৈষ্ণবধর্ম অবলম্বন করেন। এর কি ফল হয় তার দীর্ঘ বর্ণনা চৈতন্যভাগবতে আছে। আমি সে বর্ণনার কতক অংশ উদ্ধৃত ক'রে দিচ্ছি, তা থেকেই সেকালে হিন্দু-মুসলমানের পরস্পর মনোভাবের পরিচয় যথেষ্ট পাওয়া যায়। হরিদাস বৈষ্ণবধর্ম অবলম্বন করাতে—

কাজি গিয়া মুল্লুকের অধিপতি স্থানে।
কহিলেক সকল তাহার বিবরণে॥
যবন হইয়া করে হিন্দুর আচার।
ভাল মতে তারে আনি করহ বিচার॥

এ সংবাদ পেয়ে হুসেন শা 'ধরি আনিল তানে অতি শীঘ্র গতি'; হরিদাস 'আইলেন মুলুকের অধিপতি স্থান', বাদশা তাঁকে 'পরম গৌরবে বসিবারে দিল স্থান'। তার পর—

আপনে জিজ্ঞাসে তারে মুলুকের পতি।
কেন ভাই তোমার কিরূপ দেখি মতি।
কত ভাগ্যে দেখ তুমি হঞাছ যবন।
তবে কেন হিন্দুর আচারে দেহ মন॥
আমরা হিন্দুরে দেখি নাহি খাই ভাত।
তাহা ছাড় হই তুমি মহা বংশ-জাত॥
জাতি ধর্ম্ম লঙ্ঘি কর অন্য ব্যবহার।
পর লোকে কেমনে বা পাইবা নিস্তার॥
না জানিয়া যে কিছু করিলা অনাচার।
সে পাপ ঘুচাহ করি কলিমা উচ্চার॥

বাদশার প্রশ্নের উত্তরে হরিদাস

বলিতে লাগিল তারে মধুর উত্তর।
শুন বাপ সবারই একই ঈশ্বর॥
নাম মাত্র ভেদ করে হিন্দুরে যবনে।
পরমার্থে এক কহে কোরাণে পুরাণে॥
এক শুদ্ধ নিত্য বস্তু অখণ্ড অব্যয়।
পরিপূর্ণ হৈয়া বৈসে সবার হৃদয়॥
সেই প্রভু যারে যেন লওয়ায়েন মন।
সেই মত কর্ম্ম করে সকল ভুবন॥
সে প্রভুর নাম গুণ সকল জগতে।
বলেন সকল মাত্র নিজ শাস্ত্র মতে॥
যে ঈশ্বর সে পুনী সবার ভাব লয়।
হিংসা করিলেও সে তাহার হিংসা হয়॥
এতেকে আমারে সে ঈশ্বর যে হেন।
লওয়াইয়াছে চিত্তে করি আমি তেন॥
হিন্দু কুলে কেহ যেন হইয়া ব্রাহ্মণ।
আপনে আসিয়া হয় ইচ্ছায় যবন॥
হিন্দু বা কি করে তারে যার যেই কর্ম্ম।
আপনেই মৈল তারে মারিয়া কি ধর্ম্ম॥
সরাসর এবে তুমি করহ বিচার।
যদি দোষ থাকে শাস্তি করহ আমার॥'
হরিদাস ঠাকুরের সুসত্য বচন।
শুনিয়া সন্তোষ হৈল সকল যবন॥

হরিদাসের এ বিচার উপন্যাস কি ইতিহাস বলা কঠিন। তবে বাদশার সঙ্গে হরিদাসের এ কথোপকথন কাল্পনিক হলেও সেকালের হিন্দুর মনোভাবের এই সূত্রে স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। এবং—

এক শুদ্ধ নিত্য বস্তু অখণ্ড অব্যয়।
পরিপূর্ণ হৈয়া বৈসে সবার হৃদয়॥

এ জ্ঞান যার মনে জন্মলাভ করেছে, তার মনে পরধর্মবিদ্বেষ কিছুতেই থাকতে পারে না। সর্বধর্মের প্রতি tolerance তার পক্ষে স্বাভাবিক। আর হরিদাসের কথা শুনে যে 'সন্তোষ হৈল সকল যবন'—বৃন্দাবনদাসের এ ধারণা যে অমূলক, এমন কথাও জোর করে বলা যায় না। সেকালের মুলুকপতি ও তাঁর সম্প্রদায়ের মনে হিন্দুধর্মের প্রতি যদি তাদৃশ বিদ্বেষ থাকত তা হলে চৈতন্যদেব তাঁর ধর্ম বাংলায় অবাধে প্রচার করতে পারতেন না। সুতরাং বৃন্দাবনদাস যা বলেছেন তা verbally সত্য না হোক, psychologically সত্য। বঙ্গসাহিত্য থেকে হিন্দু-মুসলমানের এরূপ মনোভাবের দেদার উদাহরণ দেওয়া যায়। সুতরাং এ সাহিত্য থেকে আমরা নির্ভয়ে এ অনুমান করতে পারি যে, হিন্দু মুসলমানের যে ধর্মবিরোধের কথা আজ পলিটিক্সের ক্ষেত্রে শোনা যাচ্ছে সে বিরোধ বাঙালি উত্তরাধিকারীস্বত্বে লাভ করে নি। কোনো কোনো ইংরেজি শিক্ষিত মুসলমান লেখক এই ব'লে হিন্দুদের শাসাচ্ছেন যে, হিন্দুরা যেন মনে রাখে যে, মুসলমানরা fanatic। আমরা কিন্তু বাংলা-সাহিত্য থেকে প্রমাণ পাই যে, মুসলমান-যুগে বাংলার মুসলমান ঘোর fanatic ছিল না। নিজ ধর্মে বিশ্বাস করলেই যে পরধর্মবিদ্বেষী হতে হবে—ভগবানের এমন কোনো নিয়ম নেই।

গৌড়ের বাদশা হুসেন শার বিচারসভায় যবন-হরিদাস কেন যে মুসলমান-ধর্ম ত্যাগ ক'রে বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করেছেন, সে বিষয়ে হরিদাসের কৈফিয়ত শুনে সভাস্থ সকল মুসলমান সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। চৈতন্যভাগবতের কথা যদি সত্য বলে মেনে নেওয়া যায় তা হলে আমাদের স্বীকার করতেই হবে যে—

হরিদাস ঠাকুরের সুসত্য বচন।
শুনিয়া সন্তোষ হৈল সকল যবন ॥

সম্ভবত হরিদাসের এই কথাটাই সকলের কাছে সুসত্য ব'লে মনে হয়—

শুন বাপ সবারই একই ঈশ্বর ॥
নাম মাত্র ভেদ করে হিন্দুরে যবনে।
পরমার্থে এক কহে কোরাণে পুরাণে ॥

আজকের দিনে এ কথা ভরসা ক'রে বলা যায় যে, প্রায় সকল ধর্মেরই ঐ হচ্ছে মূলকথা। সুতরাং একটু তলিয়ে দেখলেই দেখা যায় যে, ধর্মমতের সঙ্গে ধর্মমতের মূলত কোনো প্রভেদ নেই। অথচ এক ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে আর-এক ধর্মাবলম্বীদের অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে ঘোর বিরোধ আছে। তার কারণ, সকল ধর্মের ভিতর যা সামান্য তা নিয়ে সকল ধার্মিকদের মধ্যে সদ্ভাব ঘটে না, কিন্তু প্রতি ধর্মের ভিতর যে বিশিষ্টতা আছে তাই নিয়েই ধার্মিকে ধার্মিকে পরস্পর-মারামারি করে। এই হচ্ছে মানুষের স্বভাব। 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' এ জ্ঞান যাঁর মনে উদয় হয়েছে তিনি আর ধার্মিক থাকেন না, তিনি হন দার্শনিক।

যবন-হরিদাসের মুখে ধর্মের ব্যাখ্যান শুনে সকল যবন সন্তুষ্ট হয়েছিলেন ব'লে তিনি যে এ বিচারে বেকসুর খালাস পেয়েছিলেন তা নয়; ধর্মের

সঙ্গে সব দেশেই সামাজিক আচার-ব্যবহার জড়িত থাকে, আর একালে উপরন্তু তার সঙ্গে মানুষের পলিটিকাল স্বার্থের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক হয়েছে। পুরাকালে ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে বৈদিক ধর্মের যে বিরোধ ঘটেছিল তা হচ্ছে মূলত আচারগত; আর এ বিরোধ অনেকটা পুষ্ট হয়েছিল পলিটিকাল কারণে। সেকালে এ দেশে বৌদ্ধধর্ম প্রথমত অব্রাহ্মণের ধর্ম ছিল, তার পর সে ধর্ম তুরস্ক যবন প্রভৃতি বরণ ক'রে নিয়েছিল। অশোক ছিলেন শূদ্র, কণিষ্ক ছিলেন তুরস্ক ও মিনিন্দ ছিলেন যবন অর্থাৎ গ্রীক। রাজার ধর্মের সঙ্গে রাজনীতির যে সম্বন্ধ থাকবে সে কথা বলাই বাহুল্য। যবন-হরিদাসকে রাজশাসনে যথেষ্ট শাস্তিভোগ করতে হয়েছিল। কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধে গৌড়ের বাদশার কাছে যে অভিযোগ আনা হয়েছিল তা থেকেই দেখা যায় যে, ধর্মমত পরিবর্তন করাটাই তাঁর প্রধান অপরাধ ব'লে গণ্য হয় নি। সে অভিযোগটি যে কি, তা একবার স্মরণ করা যাক। বৃন্দাবনদাস বলেন যে—

কাজি গিয়া মুল্লুকের অধিপতি স্থানে।
কহিলেক সকল তাহার বিবরণে॥
যবন হইয়া করে হিন্দুর আচার।
ভাল মতে তারে আনি করহ বিচার॥

হরিদাসের বিরুদ্ধে এ নালিশ কাজী স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে কিংবা হিন্দুদের প্ররোচনায় করেছিলেন, সে বিষয়েও সন্দেহ আছে। চৈতন্যভাগবতের কোনো কোনো পুঁথিতে উপরের চারি পংক্তির এইরূপ পাঠ আছে—

পাষণ্ডীর গণ দেখি মরয়ে জ্বলিয়া।
দশে পাঁচে যুক্তি করে একত্রে মিলিয়া॥
যবন হইয়া করে হিন্দুর আচার।
কোনখানে না দেখি এমত অবিচার॥
কালি গিয়া মুলুকের অধিপতি স্থানে।
কহিব যে ইহার সব বিবরণে॥

যবন হইয়া যেন হিন্দুয়ানি করে।
ভালমতে আনি শাস্তি করুক উহারে॥
এমত যুকতি করে পাষণ্ডীর গণ।
যবন রাজার স্থানে কৈল নিবেদন॥

উপরিউক্ত কথাগুলি যদি সত্য হয় তা হলে হরিদাসের উপর অত্যাচারের দোষ মুসলমানের ঘাড়ে চাপানো যায় না। কারণ, যেসকল ব্রাহ্মণ চৈতন্যের প্রবর্তিত বৈষ্ণবধর্মের বিরোধী ছিলেন, বৃন্দাবন দাস তাঁদেরই পাষণ্ড নামে অভিহিত করেন।

যদি কেউ যবন হয়ে হিন্দুর আচার করে তবে হিন্দুর আপত্তি কি? হিন্দুর আপত্তি এই জন্যে যে, হিন্দু অপর কারও আচার নিজে অবলম্বন করতে চায় না, আর অপর কাউকেও নিজের আচার অবলম্বন করতে দিতে চায় না। এ ছাড়া বৈষ্ণবদের একটি আচারের প্রতি সেকালের ব্রাহ্মণ-সমাজের ভয়ংকর আক্রোশ ছিল। হরিদাসের আচার ছিল এই যে, তিনি—

গঙ্গা স্নান করি নিরবধি হরি নাম।
উচ্চ করি লইয়া বুলেন সর্ব্ব স্থান॥

কে কোন্ নদীতে স্নান করবে, সে সম্বন্ধে আশা করি বাংলার নবাবি আমলেও কোনোরূপ বিধিনিষেধ ছিল না। সুতরাং ধরে নিচ্ছি যে, গঙ্গাস্নানের অপরাধে তিনি রাজ-দরবারে অভিযুক্ত হন নি। তিনি যে 'হরিনাম উচ্চ করি লইয়া বুলেন' এইটেই বোধ হয় সেকালের ব্রাহ্মণদের মতে মহা অনাচার বলে গণ্য হয়েছিল। ব্রাহ্মণরা যে উচ্চৈস্বরে নামকীর্তন করা ভালোবাসতেন না, তার অসংখ্য উল্লেখ চৈতন্যভাগবতে আছে। নিম্নে তার একটি প্রমাণ উদ্ধৃত ক'রে দিচ্ছি—

হরিনদী গ্রামে এক ব্রাহ্মণ দুর্জ্জন।
হরিদাসে দেখি ক্রোধে বলয়ে বচন॥

ওহে হরিদাস এ কি ব্যভার তোমার।
ডাকিয়া যে নাম লহ কি হেতু ইহার॥
মনে মনে জপিবা এই সে ধর্ম্ম হয়।
ডাকিয়া লইতে নাম কোন্ শাস্ত্রে কয়॥
কার শিক্ষা হরিনাম ডাকিয়া লইতে।
এই ত পণ্ডিত সভা বলহ ইহাতে॥

উত্তরে হরিদাস বক্ষ্যমাণ শ্লোক আবৃত্তি করলেন—

জপতো হরিনামানি শ্রবণে শতগুণাধিকঃ।
আত্মানঞ্চ পুনাত্যুচ্চৈর্জপন্ শ্রোতৃন্ পুনাতিচ॥

এবং তৎপরে তার ভাষায় ব্যাখ্যা করলেন। সে ব্যাখ্যার ফল হল এই—

সেই বিপ্র শুনি হরিদাসের কথন।
বলিতে লাগিল ক্রোধে মহা দুর্ব্বচন॥
দরশন কর্ত্তা এবে হৈল হরিদাস।
কালে কালে বেদ পথ হয় দেখি নাশ॥
যুগ শেষে শূদ্রে বেদ করিবে বাখানে।
এখনই তাহা দেখি শেষে আর কেনে॥
এই রূপে আপনারে প্রকট করিয়া।
ঘরে ঘরে ভাল ভোগ খাইস বুলিয়া॥
যে ব্যাখ্যা করিলি তুঁঞি এ যদি না লাগে।
তবে তোর নাক কাণ কাটি তোর আগে॥

অবশ্য এরূপ উচ্চ মনোভাব কোনো ব্রাহ্মণসন্তানের যে হতে পারে আজকের দিনে আমরা তা কল্পনাও করতে পারি না। এ যুগে আমরা সেইসব যবনকেই বেদ-বেদান্তের ব্যাখ্যাকর্তা-গুরু ব'লে মনে করি, যাঁদের জন্মভূমি হচ্ছে কালাপানির ওপারে। তবে আমরা দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করতে বাধ্য যে, শুধু যবন হরিদাসের বিরুদ্ধে নয়, ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবদের উপর অবৈষ্ণব-ব্রাহ্মণদেরও সমান আক্রোশ ছিল। বৃন্দাবনদাস বলেছেন যে—

কোথায় নাহিক বিষ্ণু-ভক্তির প্রকাশ।
বৈষ্ণবেরে সবেই করয়ে পরিহাস ॥
আপনা আপনি সব সাধুগণ মেলি।
গায়েন শ্রীকৃষ্ণ নাম দিয়া করতালি ॥
তাহাতেও দুষ্টগণ মহাক্রোধ করে।
পাষণ্ডী পাষণ্ডী মেলি ব্যঙ্গিয়াই মরে ॥
এ বামন গুলা রাজ্য করিবেক নাশ।
ইহা সবা হৈতে হবে দুর্ভিক্ষ প্রকাশ ॥
এ বামন গুলা সব মাগিয়া খাইতে।
ভাবক কীর্ত্তন করি নানা ছলা পাতে ॥
গোসাঞির শয়ন বরিষা চারি মাস।
ইহাতে কি জুয়ায় ডাকিতে বড় ডাক ॥
নিদ্রা ভঙ্গ হইলে ক্রুদ্ধ হইবে গোসাঞি।
দুর্ভিক্ষ করিব দেশে ইথে দ্বিধা নাই ॥
কেহ বলে, যদি ধান্য কিছু মূল্য চড়ে।
তবে এ গুলারে ধরি কিলাইমু ঘাড়ে ॥

এর থেকেই অনুমান করা যায় যে, খুব সম্ভবত 'মুলুকের অধিপতি স্থানে' যবন-হরিদাসের বিরুদ্ধে অভিযোগ 'পাষণ্ডীরাই' আনেন। অর্থাৎ ব্রাহ্মণরা হরিদাসকে রাজদণ্ডে দণ্ডিত ক'রে তাঁদের বৈষ্ণব হিংসা চরিতার্থ করেন। বিশেষত যখন তাঁদের ভয় ছিল যে, উচ্চৈস্বরে নামকীর্তন করলে দেশে দুর্ভিক্ষ হবে। ধর্মবুদ্ধির সঙ্গে যখন ঐহিক স্বার্থের রাসায়নিক যোগ হয় তখন তা অতি মারাত্মক বস্তু হয়ে ওঠে। তা সে স্বার্থজ্ঞান পলিটিকালই হোক আর ইকনমিকই হোক।—কোনো ব্রাহ্মণের বিরুদ্ধে এ অভিযোগ অবশ্য তাঁরা আনতে পারতেন না। 'ব্রাহ্মণ হইয়া করে হিন্দুর আচার'—এ আরজি কাজীতেও পত্রপাঠ ডিস্‌মিস্ করতেন এবং সম্ভবত সেইসঙ্গে ফরিয়াদীকেও পাগলা-গারদে পাঠিয়ে দিতেন। যবন-হরিদাসের মুখে তাঁর ধর্মমতের ব্যাখ্যান শুনে যদিচ সভাস্থ

সকল যবন সন্তুষ্ট হয়েছিলেন, তবুও যে তিনি নিস্তার পান নি তার কারণ—

সবে এক পাপী কাজী মুলুক পতিরে।
বলিতে লাগিলা শাস্তি করহ ইহারে ॥
এই দুষ্ট, আর দুষ্ট করিবে অনেক।
যবন কুলে অমহিমা আনিবেক ॥
এতেকে ইহার শাস্তি কর ভাল মতে।
নহে বা আপন শাস্ত্র বলুক মুখেতে ॥

কাজী সাহেবের কাছে এ কথা শুনে—

পুনঃ বলে মুলুকের পতি আরে ভাই।
আপনার শাস্ত্র বল তবে চিন্তা নাই ॥
অন্যথা করিব শাস্তি সব কাজীগণে।
বলিলাম পাছে আর লঘু হৈবা কেনে ॥

উত্তরে হরিদাস বলেন যে—

খণ্ড খণ্ড যদি হই যায় দেহ প্রাণ।
তবু আমি বদনে না ছাড়ি হরি নাম ॥

তার পর—

শুনিয়া তাহার বাক্য মুলুকের পতি।
জিজ্ঞাসিল এবে কি করিবা ইহা প্রতি ॥
কাজী বলে বাইশ বাজারে বেড়ি মারি।
প্রাণ লহ আর কিছু বিচার না করি ॥…
পাইক সকলে ডাকি তর্জ্জ করি কহে।
এমত মারিবে যেন প্রাণ নাহি রহে ॥
যবন হইয়া যেই হিন্দুয়ানি করে।
প্রাণান্ত হইলে শেষে এ পাপেতে তারে ॥
পাপীর বচনে সেহ পাপী আজ্ঞা দিল।
দুষ্টগণে আসি হরিদাসেরে ধরিল ॥

কাজী কাকে বলে তা আমি ঠিক জানি নে। কিন্তু হরিদাসের বিচারে বৃন্দাবন দাসের রিপোর্ট প'ড়ে মনে হয় যে, কাজী হচ্ছেন সেই জাতীয় জীব আজকাল আমরা যাঁকে বুরোক্রাট বলি। কারণ, বুরো-ক্রাটের সকল লক্ষণই এই কাজীর দেহে স্পষ্ট দেখা যায়। হরিদাসের বিরুদ্ধে কাজীর প্রধান অভিযোগ এই যে, হরিদাস 'যবন কুলে অমহিমা আনিবেক', ভাষান্তরে রাজার জাতের prestige নষ্ট করবে। দ্বিতীয় কথা হরিদাসের শাস্তি preventive হিসাবেই হওয়া কর্তব্য। কারণ, 'এই দুষ্ট আরো দুষ্ট করিব অনেক'। তার পর, কাজীর মতে শাস্তিটে exemplary হওয়া চাই, তার নিজের কথা এই 'এতেকে উহার শাস্তি কর ভাল মতে'। তার পর কাজী রায় দিলেন যে, হরিদাসকে 'বাইশ বাজারে বেড়ি মারি' অর্থাৎ প্রকাশ্যে তার শাস্তিবিধান করতে হবে, যাতে ক'রে তার শাস্তি দেখে আর কেউ প্রাণের ভয়ে 'যবন কুলে অমহিমা' না আনতে পারে।

বাইশ বাজারে মারাটা একটা নূতন শাস্তি বটে। আমাদের বিশ্বাস ছিল যে, সাত ঘাটে জল খাওয়ানোই যথেষ্ট শাস্তি। তার উপর আবার বাইশ বাজারে মার খাওয়ানো একটু বেশি হয়। তবে ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, মারের মাত্রাটা তেমন মারাত্মক ছিল না, কেননা, মারের মত মার দিলে এক বাজারেই হরিদাসকে পটল তুলতে হত। এ অনুমান যে সংগত, তার প্রমাণ বাইশ বাজারে মার খেয়েও হরিদাসের প্রাণবিয়োগ হয় নি, শেষটা তিনি শুধু অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলেন। হরিদাসের সমসাময়িক কোনো ব্যক্তি যদি ইউরোপে তার ধর্মপরিবর্তন করত, তা হলে তাকে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারা হত।

কাজী যে বুরোক্রাট তার প্রধান প্রমাণ এই যে, হুসেন শা কাজীদের কথা শুনতে বাধ্য হয়েছিলেন, যদিচ হরিদাসকে শাস্তি দিতে মোটেই তাঁর ইচ্ছে ছিল না। আজকের দিনেও দেখা যায় যে, ভারতবর্ষের বুরো-ক্রাটদের কথা ঠেলে ভারতবর্ষের সেক্রেটারিদের কিছু করবার শক্তি

নেই। ক্ষমতা যে নেই তা তিনিই জানেন যিনি লর্ড মর্লির জীবনস্মৃতি পড়েছেন।

পূর্বোক্ত দলিলের বলেই প্রমাণ হয় যে, মুসলমান আমলে রিলিজিয়াস্ কারণে হিন্দুদের উপর তাদৃশ পীড়ন হত না, হত শুধু পলিটিকাল কারণে। আজকাল কোনো কোনো ইংরেজি শিক্ষিত বাঙালি মুসলমান নিজেদের যেরূপ ঘোর ফ্যানাটিক ব'লে প্রচার করছেন, নবাবি আমলে তাঁদের জাতভাইরা যে তদ্রূপ ঘোর ফ্যানাটিক ছিলেন তার প্রমাণ মুসলমান যুগের বঙ্গসাহিত্যে পাওয়া যায় না। যে কারণে সেকালের ব্রাহ্মণরা বৈষ্ণবদের উপর ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন, সেই কারণে কাজীরা হরিদাসের উপর ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন— প্রভুত্ব নষ্ট হবার ভয়ে।

পাঠান বাদশাহের রাজত্বকালে বাংলার কোনোস্থলে যে মুসলমান কর্তৃক হিন্দুর নিগ্রহ হয় নি, এমন কথা অবশ্য আমি বলতে চাই নে। বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গলে হিন্দুর উপর মুসলমান কাজীর দৌরাত্ম্যের একটি নাতিহ্রস্ব বর্ণনা আছে। উক্ত গ্রন্থ সম্রাট্ হুসেন শাহের কালে রচিত হয়। বিজয় গুপ্ত বাখরগঞ্জের লোক। তাঁর বর্ণিত ঘটনা যদি সত্য হয় তা হলে স্বীকার করতে হয়, হুসেন শাহের আমলেও হিন্দুধর্মের উপর অত্যাচার করবার প্রবৃত্তি কোনো কোনো কাজী সাহেবের ছিল। বিজয় গুপ্ত বলেন যে, হোসেনহাটি গ্রামের নিকট হাসান হোসেন দুই ভাই মুসলমান ছিল।—

কাজিয়ানী করে তারা, জানে বিপরীত।
তাদের সম্মুখে নাই হিন্দুয়ানী রীত॥

হোসেন কাজীর দুলা নামক একটি শ্যালক ছিল। সে নাকি—

যাহার মাথায় দেখে তুলসীর পাত।
হাতে গলে বান্ধি নেয় কাজীর সাক্ষাৎ॥
পরেরে মারিতে কিবা পরের লাগে ব্যথা।
চোপড়-চাপড় মারে দেয় ঘাড়কাতা॥

যে যে ব্রাহ্মণের পৈতা দেখে তার কান্ধে।
পেয়াদা বেটা লাগ পাইলে তার গলায় বান্ধে।

এসকল কথা সত্য হলেও হতে পারে। কেননা, প্রজার উপর রাজ-শ্যালকের অত্যহিত অত্যাচার হিন্দুযুগেও যে ছিল তার প্রমাণ মৃচ্ছকটিক নাটক। আর হোসেন-শ্যালকের অত্যাচার চড়-চাপড়ের উপর তো ওঠে নি। স্বয়ং কাজী সাহেবও হিন্দুদের উপর মারপিট করতে উদ্যত হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর রাগের যথেষ্ট কারণ ছিল। কাজী সাহেবের মোল্লাকে কতকগুলো গয়লার ছেলে মিলে অযথা প্রহার দেয়। মোল্লা তাদের হাতে লাঞ্ছিত হয়ে কাজীর কাছে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করে যে—

হের দেখ দাড়ী নাহি মুখে রক্ত পড়ে।
দন্ত ভাঙ্গিয়াছে মোর চোপড়চাপড়ে ॥
পরিধান ইজার আমার দেখ সব ভাঙ্গা।
ছাগলের রক্তে দেখ মুখ মোর রাঙ্গা ॥

মোল্লার কথা—

শুনিয়া কোপিল কাজী, চারিদিকে চায় ॥
হারামজাত হিন্দুর হয় এত বড় প্রাণ।
আমার গ্রামেতে বেটা করে হিন্দুয়ান ॥
গোটে গোটে ধরিব গিয়া যতেক ছোমরা।
এড়ারুটি খাওয়াইয়া করিব জাতিমারা ॥

মুসলমানী-যুগের যেসকল বাংলা রচনার সঙ্গে আমার পরিচয় আছে তার মধ্যে অপর কোনো গ্রন্থে হিন্দুর ধর্মের প্রতি মুসলমানের বিদ্বেষের এতাদৃশ প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে একটু ভেবে দেখলেই দেখা যায় যে, এ ক্ষেত্রে কাজী সাহেব অসাধারণ fanaticismএর প্রমাণ দেন নি। আজকের দিনেও যদি ছোকরার দল কোনো খৃস্টান-পাদ্রীকে ওভাবে নিগ্রহ করে তা হলে একালের শাসনকর্তাদের হাতে তাদের সমান নিগৃহীত হতে হয়। তার পর কাজী হচ্ছেন ম্যাজিস্ট্রেট, সুতরাং ন্যায়ত তাঁর

কর্তব্য হচ্ছে ছোকরাদের ওরকম বেআইনী কাজের জন্য শাস্তি দেওয়া। আর-এক কথা, এ ক্ষেত্রে হোসেনকাজী মুখে যা বলেছিলেন কার্যত তা করেন নি। কাজীর মাতা ছিলেন হিন্দুর কন্যা; এবং তাঁর কথামতই হাসান হোসেন দু ভাই হিন্দুদের মারপিট না ক'রে নিজেরা বয়েদ লেখা তাবিজ ধারণ করেন।

এ ঘটনা সম্ভবত বিজয় গুপ্তের সম্পূর্ণ মনগড়া। দ্বিজ বংশীবদনের মনসামঙ্গলে ঐ একই ঘটনার একই রকম বর্ণনা আছে, যদিচ দ্বিজ বংশীবদন বিজয় গুপ্তের দু শ বৎসর পরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। বহুকাল পাশাপাশি বাস করবার ফলে হিন্দু-মুসলমানের পরস্পর ধর্মসম্বন্ধে কি মনোভাব জন্মেছিল তার পরিচয় দ্বিজ বংশীবদন জনৈক মুসলমানের প্রমুখাৎ দিয়েছেন—

তার মধ্যে এক জন জাতি মুসলমান।
সে বলে উচিত নহে, রাখ হিন্দুয়ান॥
একই ঈশ্বর দেখ হিন্দু-মুসলমানে।
যার তার কর্ম্ম সেই করে ধর্ম্মজ্ঞানে॥
সকলের কুলাচার স্বজিলা গোঁসাই।
পাষণ্ড হইয়া তাতে কোন কার্য্য নাই॥

যদিচ কবিকঙ্কণ স্পষ্টাক্ষরে বলেছেন যে—

উজির হলো রায়জাদা বেপারিরে দেয় খেদা
ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবের হল অরি।

তবুও তাঁর গ্রন্থে মোগলরাজ কর্তৃক ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবের উপর অত্যাচারের অপর কোনো উল্লেখ পাওয়া যায় না, এবং উক্ত 'রায়জাদা' ব্যক্তিটি কে? হিন্দু না মুসলমান? তাও আমরা অবগত নই। সেকালে হিন্দুও যে হিন্দু-ধর্মের উপর ভীষণ অত্যাচার করত তার প্রমাণ দাউদ কররানির যে সেনাপতি উড়িষ্যার দেউল দেহারা ধ্বংস করেছিলেন, তিনি হচ্ছেন কালাপাহাড় নামে বিখ্যাত, রাজু নামক জনৈক হিন্দু।

কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে সেকালের মুসলমান সমাজের আচার-ব্যবহারের একটি দেড় পাতা বর্ণনা আছে। তার কতক অংশ নিম্নে উদ্ধৃত ক'রে দিচ্ছি। কবিকঙ্কণ বলেন যে মুসলমানরা—

ফজর সময়ে উঠি, বিছায়া লোহিত পাটী,
পাঁচবেরির করয়ে নমাজ।
সোলেমালি মালা ধরে, জপে পীর পেগম্বরে,
পীরের মোকামে দেই সাঁজ॥
দশ বিশ বেরাদারে, বসিয়া বিচার করে,
অনুদিন পড়য়ে কোরাণ।
সাঁঝে ডালা দেই হাটে পীরের শিরণি বাঁটে,
সাঁঝে বাজে দগড় নিশান॥…
আপন টোপর লৈয়া বসিল অনেক মিঞা,
ভূঞ্জিয়া কাপড়ে পোঁছে হাত।
সাবাণি লোহানি আর, লোদানি সুরয়ানি চার,
পাঠান বসিল নানা জাত॥

আপন তরফ নিয়া বসিল অনেক মিঞা

কেহ নিকা কেহ করে বিয়া।

মোল্লা পড়ায়ে নিকা, দান পায় সিকা সিকা,

দোয়া করে কলমা পড়িয়া॥

করে ধরি খর ছুরী, মুরগী জবাই করি,

দশগণ্ডা দান পায় কড়ি।

বখরী জবাই যথা, মোল্লারে দেই মাথা,

দান পায় কড়ি হয় বুড়ি॥

যত শিশু মুসলমান, তুলিল মক্তব স্থান,

মখদম পড়ায় পঠনা॥

উক্ত বর্ণনার ভিতর অবশ্য বিদ্রূপ আছে, কিন্তু ধর্মবিদ্বেষ মোটেই নেই। মোল্লার উপর যে ঠাট্টা আছে, সেটিকে অনেকে মুসলমানধর্মের প্রতি বিদ্বেষের পরিচায়ক মনে করতে পারেন, তাই কবিকঙ্কণ ব্রাহ্মণ পুরোহিতের যা চরিত্র বর্ণন করেছেন সে বর্ণনাটির দু-চার ছত্র এখানে উদ্ধৃত করে দিচ্ছি—

মূর্খ বিপ্র বৈসে পুরে, নগরে যাজন করে,

শিখয়ে পূজার অধিষ্ঠান।

চন্দন তিলক পরে, দেব পূজে ঘরে ঘরে,

চাউলের বোচকা বান্ধে টান॥…

গালি দিয়া লণ্ডভণ্ডে ঘটক ব্রাহ্মণে দণ্ডে

কুলপাঁজী করিয়া বিচার।

যে নাহি গৌরব করে, সভায় বিড়ম্বে তারে,

যাবৎ না পায় পুরস্কার॥

ধর্ম যাই হোক না কেন, ধর্মযাজকেরা হচ্ছে একটি ব্যাবসাদারের দল। সুতরাং যারা ধর্মের ব্যাবসা করে, কোনো সমাজের লোকই তাদের তাদৃশ ভক্তির চোখে দেখে না।

মুসলমান শিশুদের যে অনবরত পড়ানো হত, এবং মুসলমানরা যে

দশ-বিশ বেরাদরে বসে অনুদিন স্বশাস্ত্রের চর্চা করত, এটা অবশ্য তাদের সভ্যতারই পরিচায়ক, আর এ সভ্যতা সেই শ্রেণীর, আজকের দিনে আমরা যাকে ডিমক্রাটিক বলি।

কবিকঙ্কণের একটি বিদ্রূপ আমার কাছে অতি অদ্ভুত লাগে। মুসলমানদের মালাজপা নিয়ে শুধু কবিকঙ্কণ নয়, ভারতচন্দ্রও বিদ্রূপ করেছেন। মালা কি হিন্দুরা জপে না? তবে মুসলমানের মালাজপায় কি দোষ হল? তারা অবশ্য রুদ্রাক্ষের কি তুলসীকাঠের মালা জপে না, জপে তসরির অর্থাৎ স্ফটিকের মালা। আর স্ফটিকের মালা যে পুরাকালে হিন্দুরাও জপতেন, তার পরিচয় কুমারসম্ভবের বক্ষ্যমাণ শ্লোকে পাওয়া যায়—

অথাগ্র হস্তে মুকুলীকৃতাঙ্গুলৌ
সমর্পয়ন্তী স্ফটিকাক্ষমালিকাম্।
কথঞ্চিদদ্রেস্তনয়া মিতাক্ষরং
চিরব্যবস্থাপিতবাগ ভাষত॥ ৫ম সর্গ, ৬০ শ্লোক

আমরা হিন্দুরা জ্ঞানমার্গীই হই, ভক্তিমার্গীই হই, আর কর্মমার্গীই হই, উপরন্তু আমরা সকলেই ছুতমার্গী। ফলে যাদের আচার-ব্যবহার অন্য-রূপ, তাঁদের সঙ্গে এক গ্রামে হলেও এক পাড়ায় আমাদের বাস করা চলে না। অতি পুরাতন কাল থেকে ব্রাহ্মণরা অগ্রহারে অর্থাৎ স্বতন্ত্র ব্রাহ্মণ পল্লীতে বাস করতেন তার প্রমাণ মহাভারতে আছে। বিদর্ভরাজ ভীম, কন্যা দময়ন্তী ও জামাতা নলের খোঁজে যেসকল ব্রাহ্মণকে দেশে-বিদেশে পাঠিয়েছিলেন তাঁদের বলেছিলেন যে তাঁর মেয়ে-জামাইয়ের খবর আনতে পারবে তাকে 'অগ্রহারাংশ্চ দাস্যামি গ্রামং নগরসম্মিতম্'। মাদ্রাজে আজও অগ্রহার আছে এবং কোনো অস্পৃশ্য হিন্দুর ব্রাহ্মণ পল্লীর পথ দিয়ে হাঁটবার জো নেই। আজকে কেবল দেশের নিম্নশ্রেণীর হিন্দুরা যে সত্যাগ্রহ করবে ব'লে ব্রাহ্মণদের শাসাচ্ছে, তার কারণ তারা

ঐ ব্রাহ্মণ-পথে চলবার অধিকারে বঞ্চিত। হিন্দুর ছায়া মাড়ালে হিন্দুর যখন ধর্ম নষ্ট হয় তখন সেকালে হিন্দু মুসলমান যে পাশাপাশি বাস করতে পারত না, সে কথা বলাই বাহুল্য। পরস্পরের কাছ থেকে দূরে দূরে থাকাই তারা সুবুদ্ধির কাজ মনে করত।

ইদানীং দক্ষিণ-আফ্রিকায় যাকে class area বলে অর্থাৎ স্বতন্ত্র জাতের স্বতন্ত্র বাসস্থানের ব্যবস্থা, পূর্বে সেই বন্দোবস্তই বাংলায় প্রচলিত ছিল। সে কালের অনেক গ্রন্থে এ ব্যবস্থার উল্লেখ আছে। কবিকঙ্কণ বলেন—

বীরের পাইয়া পাণ, বসিল মুসলমান
পশ্চিম দিক বীর দিল তারে ॥
আইসে চড়িয়া তাজি, সৈয়দ মোগল কাজী,
খয়রাতে বীর দিল বাড়ি।
পুরের পশ্চিম পটী, বলায় হাসন হাটী,
একত্র সবার ঘর বাড়ি ॥

কবিকঙ্কণের পূর্ববর্তী কবি দ্বিজ হরিরামও মুসলমান পাড়ার প্রায় একই বর্ণনা করে গিয়েছেন। তিনি বলেন যে—

বীরের সম্মান পায়া পশ্চিম দিগেতে গিয়া
বস্যে যত মোগল পাঠান।
হাসনহাটীর মাঝে সৈদ সকল রাজে
সেকজাদা বৈস্যে পায়া পান।

এসকল বর্ণনা পড়ে মনে হয় যে, ষোড়শ শতাব্দীতে এ দেশে মুসলমান বস্তি মাত্রেরই নাম ছিল হাসনহাটী এবং গ্রামের পশ্চিম দিকেই তারা বাস করত। অন্য সকল দিক ছেড়ে তারা যে কেন পশ্চিমদিক পছন্দ করত জানি নে, সম্ভবত ঐ দিকটা মক্কার দিক বলে।

দ্বিজ হরিরাম এবং কবিকঙ্কণের বর্ণনা থেকে আমরা দেখতে পাই যে, ষোড়শ শতাব্দীতে মুসলমানদের ভিতর দস্তুরমত জাতিভেদ ছিল।

কবিকঙ্কণ এইসকল জাতির উল্লেখ করেছেন— ১ জোলা, ২ গোলা, ৩ মুকেরি, ৪ পীঠারি, ৫ কাবারি, ৬ সানাকর, ৭ পটুয়া, ৮ তীরকর, ৯ কাগতি, ১০ কলন্দর, ১১ রঙ্গরেজ, ১২ হাজাম, ১৩ কসাই।

এসকলই ছিল নিম্নশ্রেণীর মুসলমান। কারও কাজ ছিল কাপড় বোনা, কারও গোরু মারা, কারও সানা বাঁধা, কারও তীর গড়া, কারও পীঠে বেচা, কারও মাছ মারা, কারও কাগজ তৈরি করা, কারও পট আঁকা, কারও কাপড় রঙানো, কারও বলদ চালানো। তার পর 'পয়মাল' নামে অদ্ভুত জাত ছিল, যারা 'হিন্দু হয়ে মুসলমান'।

কিন্তু এসকল মুসলমানের সঙ্গে হিন্দু কবিরা মোগল-পাঠান ও সৈয়দদের সঙ্গে একটা বিশেষ পার্থক্য দেখান। দেশী মুসলমানদের অনেকেই নাকি 'রোজা নমাজ না করিয়া' মুসলমান, আবার এদের মধ্যে কোনো কোনো জাত নাকি—

নিরন্তর মিথ্যা কহে, নাহি রাখে দাড়ি।

মোগল-পাঠানদের কাজ ছিল শুধু যুদ্ধ করা। দ্বিজ হরিরাম তাঁদের এই বলে পরিচয় দিলেন—

কেহ বা সিপাই হয় বীর বিরাদবি বয়
পায়দল হৈয়া কেহ রহে।
কেহ বা ব্যাপার করে কেহ যায় দেশান্তরে
অনুক্ষণ কেহ যুদ্ধ চাহে॥

আমাদের ভাষায় বলতে হলে মোগল-পাঠান-সৈয়দরা সব ছিল ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য, আর জোলা-পোনারা সব ছিল শূদ্র। মুসলমানদের এই জাতি-ভেদ অনেকের কাছে একটু অদ্ভুত লাগে। এমনকি, কোনো কোনো ইউরোপীয় পণ্ডিতের মতে হিন্দুধর্মের প্রভাবে মুসলমানদের ভিতর এই জাতিভেদের সৃষ্টি হয়েছে। আমার মনে হয়, যেসকল হিন্দু মুসলমানধর্ম গ্রহণ করেছিল তারা হিন্দুধর্ম ত্যাগ করেছিল, কিন্তু নিজের নিজের

জাতব্যাবসা ছাড়ে নি, ফলে জাতও ছাড়ে নি। তাতেই হিন্দুর অনুরূপ জাত মুসলমানদের মধ্যেও আছে। শূন্যপুরাণ প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের প্রথম গ্রন্থ, আর অন্নদামঙ্গল শেষ। এ উভয় গ্রন্থেই মুসলমান কর্তৃক হিন্দুর দেবমন্দিরের উপর দৌরাত্ম্যের উল্লেখ আছে। আর উভয়কালেই একই ক্ষেত্রে মন্দির ভগ্ন করা হয়— অর্থাৎ উড়িষ্যায়। সেকালের বঙ্গ-সাহিত্য আলোচনা করলে দেখা যায় যে, মুসলমান-বাদশারা দেউল দেহারা ভাঙতেন, জাজপুরে জাজনগরে ও উড়িষ্যায়। শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'বাঙ্গালার ইতিহাসে' প্রমাণ করেছেন যে, যার নাম জাজনগর, তারই নাম উড়িষ্যা। খাস বাংলার কোনো মন্দির-ধ্বংসের উল্লেখ বঙ্গসাহিত্যে নেই। এর কারণ, বোধ হয়, সেকালে বাংলাদেশে এমন কোনো মন্দির ছিল না যা কোনো বিধর্মীর চক্ষুঃশূল হত। ভারতচন্দ্র তাঁর গ্রন্থারম্ভে বলেছেন যে নবাব আলিবর্দি খাঁ—

> ভাইপো সৌলদজঙ্গে খালাস করিয়া।
> উড়িষ্যা করিল ছার লুঠিয়া পুড়িয়া॥
> বিস্তর লস্কর সঙ্গে অতিশয় জুম।
> আসিয়া ভুবনেশ্বরে করিলেক ধুম॥
> ভুবনে ভুবনেশ্বর মহেশের স্থান।
> দুর্গা সহ শিবের সর্ব্বদা অধিষ্ঠান॥
> দুরাত্মা মোগল তাহে দৌরাত্ম্য করিল।
> দেখিয়া নন্দীর মনে ক্রোধ উপজিল॥
> মারিতে লইলা হাতে প্রলয়ের শূল।
> করিব যবন সব সমূল নির্মূল॥

উপরিউক্ত বিবরণ পড়ে মনে হয় যে, 'History repeats itself' —এ কথা ঠিক। বাংলার শেষ পাঠান বাদশা দাউদ কররানি যে কাজ করেছিলেন, বাংলার শেষ মোগল নবাবও ঠিক সেই কাজ করেছিলেন। দাউদ কররানির সেনাপতি কালাপাহাড়ও ভুবনেশ্বরে গিয়ে ধুম

করেছিলেন। এসব বর্ণনা পড়ে মনে হয় যে, পাঠান-মোগলদের হিন্দুর উপর ততটা বিদ্বেষ ছিল না যতটা বিদ্বেষ ছিল হিন্দু আর্টের উপর। ভারতচন্দ্র বলেন—

নন্দী মারিতে লইলা হাতে প্রলয়ের শূল।

কালাপাহাড় কিন্তু ভুবনেশ্বরের নন্দীর নাসাকর্ণ ছেদন করেছিলেন। সেই নাসাকর্ণহীন নন্দী আজও ভুবনেশ্বরের মন্দিরের দ্বার রক্ষা করছে।

দাউদ কররানি অতিশয় অপদার্থ বাদশা ছিলেন, থাকবার ভিতর তাঁর ছিল শুধু অসামান্য রূপ। আলিবর্দি খাঁ সুপুরুষ ছিলেন কি না জানি না, কিন্তু তিনি যে কাপুরুষ ছিলেন তার প্রমাণ ভারতচন্দ্রেই পাওয়া যায়। আলিবর্দি খাঁ ভুবনেশ্বরে ধুম করবার পর বর্গীরা যখন বাংলা দেশ আক্রমণ করলে, তখন—

পলাইয়া কোঠে গিয়া নবাব রহিল।
কি কহিব বাঙ্গালার যে দশা হইল॥
লুঠিয়া ভুবনেশ্বর যবন পাতকী।
সেই পাপে তিন সুবা হইল নারকী॥

ভারতচন্দ্রের এসকল কথা প্রামাণ্য, কেননা, এসকল ঘটনা তিনি নিজে দেখেছিলেন, এবং আলিবর্দি খাঁর অত্যাচারের তাঁর আশ্রয়দাতা রাজা কৃষ্ণচন্দ্র একজন বিশেষ ভুক্তভোগী ছিলেন।

কিন্তু আলিবর্দি খাঁ যে উড়িষ্যা ছারখার করেছিলেন, তার কারণ আসলে পলিটিকাল। কারণ যে কি তা ভারতচন্দ্রের মুখেই শোনা যাক—

কটকে মুরসীদ্‌কুলি খাঁ নবাব ছিল।
তারে গিয়া আলিবর্দ্দি খেদাইয়া দিল॥
কটকে হইল আলিবর্দ্দির আমল।
ভাইপো সৌলদজঙ্গে দিলেন দখল॥
নবাব সৌলদজঙ্গ রহিলা কটকে।
মুরাদবাখর তারে ফেলিল ফাটকে॥

লুঠি নিল নারী গারী দিল বেড়ি তোক।
শুনি মহাবদজঙ্গ চলে পেয়ে শোক ॥
উত্তরিল কটকে হইয়া ত্বরাপর।
যুদ্ধে হারি পলাইল মুরাদবাখর ॥
ভাইপো সৌলদজঙ্গে খালাস করিয়া।
উড়িষ্যা করিল ছার লুঠিয়া পুড়িয়া ॥

পররাজ্য জয় করতে হলে যে fire and sword -এর নির্মম ব্যবহার করতে হয়, এ কথা স্বয়ং বিস্‌মার্ক বলে গিয়েছেন এবং পণ্ডিত-মূর্খ-নির্বিচারে সকল জর্মান সমান শিরোধার্য করেছেন। যদি কেউ বলেন যে, পলিটিকাল কারণে উড়িষ্যা পুড়িয়ে ছারখার করলেই তো হত, ভুবনেশ্বরের মন্দিরের উপর হস্তক্ষেপ করবার তো কোনোই প্রয়োজন ছিল না। এ আপত্তির উত্তর স্বয়ং ভারতচন্দ্রই দিয়েছেন। তিনি বলেন—

নগর পুড়িলে দেবালয় কি এড়ায়।

ভারতচন্দ্রের কথা যে সত্য, তা জর্মানরাও সে দিন Rheimএর অপূর্ব সুন্দর গীর্জার উপর গোলা চালিয়ে প্রমাণ করেছেন। আর পৃথিবীর ভিতর অদ্বিতীয় ধার্মিক ও দার্শনিক জাত জর্মানরা যে খৃস্টধর্মের বিরোধী, আশা করি, এমন কথা কেউ বলবেন না। সুতরাং আলিবর্দি যে হিন্দু-ধর্ম বিদ্বেষী, এমন কথা জোর করে বলা যায় না।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে, অর্থাৎ বাংলায় মুসলমান আসবার সাড়ে ছ-শ বৎসর পরে, পরস্পরের ধর্ম সম্বন্ধে হিন্দু-মুসলমানের মনোভাব কি ছিল, তাও আমরা ভারতচন্দ্রের লেখা থেকেই জানতে পাই।

'মানসিংহে' জাহাঙ্গীরের সঙ্গে ভবানন্দ মজুমদারের যে কথোপকথন আছে সেটি অবশ্য আগাগোড়া কাল্পনিক। কিন্তু ভারতচন্দ্রের কালে হিন্দু-মুসলমান তর্ক করতে বসলে হিন্দু যে ভবানন্দ মজুমদারের কথা ও মুসলমান জাহাঙ্গীরের কথা বলতেন, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

মনে রাখবেন যে, আদ্যোপান্ত অন্নদামঙ্গল কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় সুর-

সংযোগে আবৃত্তি করা হত এবং সে সভায় সভাসদ হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই ছিল। এ ক্ষেত্রে ভারতচন্দ্র এমন-কোনো কথারই অবতারণা করেন নি যা উভয় সম্প্রদায়ের সভাসদদিগের অবোধ্য কি অপ্রিয় ছিল।

আপরিতোষাদ্বিদুষাং ন সাধু মন্যে প্রয়োগবিজ্ঞানম্।

কালিদাসের এ উক্তির সঙ্গে ভারতচন্দ্রের নিশ্চয়ই পরিচয় ছিল। সুতরাং ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, ভারতচন্দ্র হিন্দু-মুসলমান নির্বিচারে সকল সভাজনকে পরিতুষ্ট করতে চেষ্টা করেছিলেন। প্রথমেই চোখে পড়ে যে, এ কথোপকথনে পরিহাস দেদার আছে। বিশেষত উভয় ধর্মের আচার-অনুষ্ঠান নিয়ে উভয় পক্ষই নানারূপ রঙ্গব্যঙ্গ করেছেন। ইংরেজি ভাষায় যাকে scepticism বলে, তার একটানা সুর এ তর্কের ভিতর আগাগোড়া রয়ে গিয়েছে। রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভার রসিকতা এ প্রবন্ধে উদ্ধৃত করা আমি সংগত মনে করি না।

আচার-অনুষ্ঠান বাদ দিয়ে যথার্থ ধর্মমত সম্বন্ধে উভয়ের ভিতর যে বিশেষ-কোনো প্রভেদ ছিল এ তর্ক পড়ে তো তা মনে হয় না। ভবানন্দ মজুমদারের মুখ দিয়ে ভারতচন্দ্র বলিয়েছেন যে—

হিন্দু মুসলমান আদি জীব জন্তু যত।
ঈশ্বর সবার এক নহে দুই মত।
পুরাণের মত ছাড়া কোরাণে কি আছে।
ভাবি দেখ, আগে হিন্দু মুসলমান পাছে।

এ কথা আমরা অন্য কবিদের মুখেও বহুবার শুনেছি—তবে ভারতচন্দ্রের কথার নূতনত্ব এই যে, তার ভিতর ঐতিহাসিক যুক্তি আছে, আর তার পর হিন্দু মুসলমানকে জীবজন্তুর দলে ফেলাটায় নিতান্ত আধুনিক ধরনের প্রাধান্যই ফুটে ওঠে। এ ধরনের কথাবার্তায় ভক্তির চাইতে জ্ঞানের কথা বেশি। জাহাঙ্গীর বলেছিলেন যে, হিন্দুর শাস্ত্র সয়তানবাজী, উত্তরে ভবানন্দ বলেন যে—

ঈশ্বরের বাক্য বেদ আগম পুরাণ।
সয়তান বাজী সেই এ যদি প্রমাণ॥
সেই ঈশ্বরের বাক্য কোরাণ যে কয়।
সেহ সয়তান বাজী কহিতে কি ভয়।

অর্থাৎ কোরান যদি revelation হয় তা হলে বেদও তাই, আর বেদ যদি তা না হয় তো কোরানও তা নয়। বলা বাহুল্য যে, এ রকমের তর্ক নিতান্ত একেলে। ভারতচন্দ্র খৃস্টানধর্ম সম্বন্ধে বলেছেন—

যবনেরে কত ভাল ফিরিঙ্গির মত।
কর্ণবেধ নাহি করে না দেয় সুন্নত।
শৌচ আচমন নাহি যাহা পায় খায়।
কেবল ঈশ্বর আছে বলে এই দায়।

যিনি সকল ধর্মকে সমান নজরে দেখতে পারেন, বলা বাহুল্য, তাঁকে কোনো ধর্মেরই গোঁড়া ভক্ত বলা যায় না। আমার মনে হয় যে, বহুকাল পাশাপাশি বাস করবার ফলে হিন্দু-মুসলমানের মনোভাব পরস্পরের মতামত সম্বন্ধে যথেষ্ট উদারতা লাভ করেছিল। অনেকে বলবেন যে, এই সকৌতুক উদারতা সে যুগের decadent মনোভাবের পরিচয় দেয়। তা হতে পারে, কিন্তু গোঁড়ামি ও বিদ্বেষবুদ্ধির যে পরিচয় দেয় না, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। সে যাই হোক, প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের প্রসাদে আমরা এ সত্যের পরিচয় পাই যে, বর্তমানে হিন্দু-মুসলমানের ধর্মবিরোধ যদি একটা জাতীয় মহাসমস্যা হয়ে উঠে থাকে তো সে সমস্যা আমরা উত্তরাধিকারস্বত্বে লাভ করি নি। সমগ্র প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে cow-killing riotএর নামগন্ধ পর্যন্ত নেই, যদিচ মারপিট দাঙ্গা-হাঙ্গামা সেকালে নিত্যকর্মের মধ্যে ছিল।

শ্রীক্ষিতিমোহন সেন

হিন্দু-মুসলমানের যুক্তসাধনা

দাদূ কবীর রজ্জব প্রভৃতি নব ভাব প্রবর্তকগণের সাধনার পরিচয়। সব সংঘর্ষের অবসান সমন্বয়-চেষ্টায়। সে যুগের সংঘর্ষও এই সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম নয়। সেই তথ্যই লেখক বিভিন্ন হিন্দু-মুসলমান সাধকের নানা কথা উদ্ধৃত করিয়া আমাদের শুনাইয়াছেন।

—প্রবাসী

A perusal of the publication is sure to strengthen the faith, at present unfortunately flagging and fading a little, of the people in their fundamental cultural unity, as the learned author has drawn on historical evidence, which cannot tell lies.

—Indian P. E. N.

শ্রীবিনয়েন্দ্রমোহন চৌধুরী

বিভক্ত ভারত

বিভক্ত ভারতের পিছনে যেসব শক্তি ও কূটনীতি কাজ করিয়াছে তাহার অতি সুন্দর একটি ছবি। —যুগান্তর

স্বাধীনতা-লাভের আশা নিয়ে ভারতবাসী যে সংগ্রাম করেছে, এ বই তার আদ্যন্ত ইতিহাস। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস যাঁরা জানতে চান তাঁদের অবশ্য পাঠ্য। —পূর্বাশা

প্রতি খণ্ড মূল্য আট আনা

হিন্দু মুসলমান প্রসঙ্গ

কাজী আবদুল ওদুদ

হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ

"এ দেশে হিন্দু-মুসলমান বিরোধের বিভীষিকায় মন যখন হতাশ্বাস হয়ে পড়ে, এই বর্বরতার অন্ত কোথায় ভেবে পায় না, তখন মাঝে মাঝে দূরে দূরে সহসা দেখতে পাই দুই বিপরীত কূলকে দুই বাহু দিয়ে আপন করে আছে এমন এক-একটি সেতু। আবদুল ওদুদ সাহেবের চিত্তবৃত্তির ঔদার্য সেই মিলনের একটি প্রশস্ত পথ রূপে যখন আমার কাছে প্রতিভাত হয়েছে তখনি আশান্বিত মনে আমি তাঁকে নমস্কার করেছি। সেইসঙ্গে দেখেছি তাঁর মননশীলতা, তাঁর পক্ষপাতহীন সূক্ষ্ম বিচারশক্তি, বাংলাভাষায় তাঁর প্রকাশশক্তির বিশিষ্টতা। তাই একদিন সমাদরপূর্বক তাঁকে শান্তিনিকেতন আশ্রমে আহ্বান করেছি, অনুরোধ করেছি বিশ্বভারতীর বিদ্যাভবনে বক্তৃতা করবার জন্যে। আমার সাগ্রহ প্রত্যাশা ক্ষুণ্ণ হয় নি এই আনন্দটুকু জানাবার অভিপ্রায়ে আমার এই কয়টি ছত্র লেখা।" —রবীন্দ্রনাথ

মূল্য এক টাকা

প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে হিন্দু-মুসলমান গ্রন্থের প্রবন্ধ মাঘ ও ফাল্গুন ১৩৩০ ও জ্যৈষ্ঠ ১৩৩১ মাসিক বসুমতীতে প্রকাশিত।

লোকশিক্ষা গ্রন্থমালা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
বিশ্বপরিচয় ১॥০

সুরেন ঠাকুর
বিশ্বমানবের লক্ষ্মীলাভ ২।০

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
ভারতের ভাষা ও ভাষাসমস্যা ২।০

শ্রীপ্রমথনাথ সেনগুপ্ত
পৃথ্বীপরিচয় ১।০

শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুর
প্রাণতত্ত্ব ২।০

শ্রীপশুপতি ভট্টাচার্য
আহার ও আহার্য ১।০

শ্রীনিত্যানন্দবিনোদ গোস্বামী
বাংলা সাহিত্যের কথা ১॥০

শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
বাংলা উপন্যাস ২৲

শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য
ভারত-দর্শনসার ৩।০

শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য
ব্যাধির পরাজয় ১॥০
পদার্থবিদ্যার নবযুগ ৩৲

শ্রীনির্মলকুমার বসু
হিন্দুসমাজের গড়ন ২॥০

শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু
হিউএনচাঙ ২॥০, ৩৲

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি
পূজা-পার্বণ ৩৲, ৪৲